বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, বিয়াল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩১/ডিসেম্বর ২০২৪

শহীদুল জহিরের *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল* : উত্তর-আধুনিক পাঠ

নিপা জাহান*

সারসংক্ষেপ

সে রাতে পূর্ণিমা ছিল (১৯৯৫) শহীদুল জহিরের (১৯৫৩-২০০৮) প্রকাশিত দ্বিতীয় উপন্যাস। এই উপন্যাসের বিশ্লেষণাত্মক পাঠে উত্তর-আধুনিক তত্ত্বের বিবিধ দিকের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। বয়ন-বৈশিষ্ট্যের বিশেষত্ব এই টেক্সটকে বর্ণনবিদ্যার সূত্রে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে উৎসাহিত করে। উপন্যাসটির ন্যারেটিভের ভেতর প্রবিষ্ট ইন্টারটেক্সটচুয়ালিটি, হিস্টোরিগ্রাফি, আইরনি, জাদুবাস্তববাদী অনুষঙ্গসহ উত্তর-আধুনিক অপরাপর কলাকৌশল। রূপকথা বা কিংবদন্তির আদলে, ইতিহাসের ফ্রেম ব্যবহার করে, দেশজ নাট্যরীতির আবহ ও উপস্থাপনশৈলীর প্রয়োগে সুহাসিনীর মফিজুদ্দিন মিয়ার জীবন ও ক্ষমতা-অক্ষমতার দ্বন্দ্বের প্রথাগত প্লটকে অস্বীকার করে এই উপন্যাসে প্রাবল্য পেয়েছে। তবে এই টেক্সটের বয়ন সম্পাদনে ঔপন্যাসিক এর সঙ্গে কয়েকটি উপাখ্যান যুক্ত করেছেন। এতে মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাঙালির রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতার গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছেন লেখক তাঁর নিজস্ব উপস্থাপনরীতিতে। উত্তর-আধুনিকবাদী তত্ত্বের প্রয়োগ ও ডিফেমিলারাইজড উপস্থাপনে ঔপন্যাসিকের নিরীক্ষা কীভাবে এই উপন্যাসে সাফল্য লাভ করেছে তা দেখবার একটি প্রচেষ্টা এই প্রবন্ধ।

চাবি শব্দ: উত্তর-আধনিকতাবাদ, বর্ণনবিদ্যা, ইন্টারটেক্সটচুয়ালিটি, জাদুবাস্তববাদ।

এক

পরিণত পুঁজিবাদী (লেট ক্যাপিটালিস্ট) সময়ের সাংস্কৃতিক মতবাদ হিসেবে উত্তর-আধুনিকবাদ পরিচিত। সাধারণভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) পরবর্তীকালে বিশ্বজুড়ে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক বিপর্যয় তথা সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে এই মতবাদের উদ্ভব ঘটেছিল। কেন্দ্রবিমুখতা বা বিকেন্দ্রীকরণ (ডিসেন্ট্রালাইজেশন) এই তত্ত্বের প্রধান বিশেষত্ব। ইহাব হাসানসহ বেশ কয়েকজন তাত্ত্বিক উত্তর-আধুনিকবাদের ধারণা পরিণত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছেন। তবে জঁ ফ্রাঁসোয়া লিয়োতারের *দি পোস্টমডার্ন কন্ডিশন : অ্যা রিপোর্ট অন নলেজ*-কে এই তত্ত্বের মেনিফেস্টো হিসেবে ধরা হয়। উন্নত রাষ্ট্রসমূহের উচ্চবিকশিত সমাজ (হাই সোসাইটি) সম্পর্কিত এই রিপোর্ট ক্রমে বিশ্বের সব রাষ্ট্রে কমবেশি চর্চিত ও প্রভাব বিস্তারকারী হয়ে উঠেছে। লিয়োতার একে চিহ্নিত করেছেন 'অবযুক্তি' (প্যারালগিজম)-র দর্শন হিসেবে। মহা আখ্যানের (গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ) পরিবর্তে ক্ষুদ্র আখ্যান বা ডিসকোর্স তৈরি, অ্যান্টিফর্ম, বিনির্মাণ, অন্তর্বয়ান, আয়রনি, জাদুবাস্তববাদের প্রকাশে উত্তর-আধুনিকবাদ সাহিত্যে রূপায়িত হয়। পপুলারিজম, প্লুরালিজম, কার্নিভালিজম পোস্টমডার্নিজমের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক নানা বিষয় এই তত্ত্বের অন্তর্গত। উত্তর-আধুনিক শিল্প-সাহিত্যের প্রতিপাদ্য

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পর্কে লিয়োতার তাঁর রিপোর্টে বলেন– 'উপস্থাপন-অযোগ্য' (আনপ্রেজেন্টেবল)–কে সামনে অগ্রসর করানো ও 'নতুন উপস্থাপনার সূত্র সন্ধান' করা। জ্ঞানতাত্ত্বিক সীমা নির্ধারণ এই তত্ত্বের জন্য প্রযোজ্য নয়। কারণ বর্তমানকেও এই তত্ত্ব অধিগ্রহণ করেছে। তবে অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণের সাহায্যে সাহিত্যে এই তত্ত্বের উপস্থিতি শনাক্ত করা যায়, সেই সূত্রেই সম্ভব উত্তর-আধুনিক সাহিত্য-বিশ্লেষণ ও গবেষণা।

উত্তর-আধুনিকবাদ বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে একটি গুচ্ছতত্ত্ব। বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদ হিসেবে এই তত্ত্ব মানবচিন্তার ইতিহাসে যেকোনো বিষয়কে বিবেচনা-পুনর্বিবেচনা ও প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়। প্রতিষ্ঠিত, আরোপিত ও পূর্ব-নির্ধারিত সিদ্ধান্ত পরিহার করে এই তত্ত্ব নিজস্ব ধারায় ঘটনা, বিষয় বা ইতিহাসকে অ-বিনির্মাণ করে। তাই সাহিত্যে বিশেষত কথাসাহিত্যের অন্তর্গত উপর্যুক্ত ব্যাপারাদিকে এই প্রক্রিয়ায় সাহিত্যিক উপস্থাপন করতে পারেন। আবার বহুত্ববাদকে উত্তর-আধুনিকেরা গুরুত্ব দেবার ফলে একই ঘটনা বা কাহিনির নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ, অব-নির্মাণের সুযোগ সাহিত্যের বৈচিত্র্যের জন্য প্রয়োজন। আবির্ভাবগত বিবেচনায় দীর্ঘ[১], আলোচনার পরিধিতে বিশাল ও বাইনারিপূর্ণ তত্ত্ব উত্তর-আধুনিকবাদ সম্পর্কে প্রারম্ভিক সংক্ষিপ্ত সূত্রসমূহ শহীদুল জহিরের উপন্যাস *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল* (১৯৯৫)-এর পাঠ ও বিশ্লেষণে খুবই প্রাসঙ্গিক।

দুই

শহীদুল জহির সাম্প্রতিক বাংলাভাষার সর্বাধিক আলোচিত কথাকার। জীবদ্দশায় প্রায় অনালোচিত এই কথাসাহিত্যিক পাঠক-গবেষকের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছেন তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে[২], অর্থাৎ চলমান শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষ থেকে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তাঁর মাত্র তিনটি গল্পগ্রন্থ ও চারটি উপন্যাস তাঁকে লেখক হিসেবে খ্যাতির চূড়ায় আসীন করেছে। শহীদুল জহিরের দ্বিতীয় প্রকাশিত উপন্যাস *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল*। কিছুটা নিওক্রিটিক ও খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গিযোগে তাঁর এই টেক্সট আলোচনা ও মূল্যায়নের কিছু প্রয়াস লক্ষণীয়[৩] হলেও উত্তর-আধুনিকবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হয়নি। অথচ *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল* উপন্যাসটির বিশ্লেষণে এই মতবাদ গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানত, বর্ণনবিদ্যার (ন্যারেটোলজি) বিবিধ কলাকৌশলের সাহায্যে এই উপন্যাস বিশ্লেষণযোগ্য। তাছাড়া উত্তর-আধুনিকবাদী উপন্যাস হিসেবে এতে ইন্টারটেক্সচুয়ালিটি, হিস্টোরিগ্রাফি, আইরনি ও জাদুবাস্তববাদী অনুষঙ্গের প্রয়োগ লক্ষণীয়। উল্লেখ প্রয়োজন, উপন্যাসের ন্যারেটিভের ভেতর অপরাপর অনুষঙ্গসমূহের উপস্থিতি।

তিন

রূপকথা বা কিংবদন্তির আদলে ইতিহাসের ফ্রেম ব্যবহার করে সুহাসিনীর মফিজুদ্দিন মিয়ার জীবন ও ক্ষমতা-অক্ষমতার যে মূল আখ্যান প্রথাগত প্লটকে অস্বীকার করে এই উপন্যাসে প্রাবল্য পেয়েছে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বেশ কয়েকটি উপাখ্যান। *শহীদুল জহির নির্বাচিত উপন্যাসের* ব্লার্বে *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল* প্রসঙ্গে লেখা আছে–

> এই গল্প একটা গ্রামের, মফিজউদ্দিন এবং চন্দ্রভান, মোল্লা নাসিরউদ্দিন এবং দুলালি, আবু বকর সিদ্দিক এবং আলেকজানের। এই গল্প মফিজউদ্দিনের বন্ধু করিম খাঁর ছেলে আফজাল খাঁর পরিবারেরও। গরীব কৃষকের বংশধর, আমরা, আমাদের পথচলার গল্প এটা, এই গল্প আমাদের উত্থান এবং পতনের। একটা গ্রাম তো একটা দেশই – আমরা বিবর্তিত হই, আমাদের গ্রামের সামাজিক সম্পর্কের সূত্রগুলো পাল্টায় এবং আমরা দেখি আমাদের দেশই বদলে যাচ্ছে। এই ধারা চলে। অথবা এই গল্প হয়তো শুধুই ভালবাসার, প্রেমের, ভালবাসার আলৌকিক আনন্দের এবং বেদনার হেমকান্তি সৌন্দর্যের।[৪]

এই বক্তব্যে আলোচ্য উপন্যাসের আখ্যান-উপাখ্যানের বৃত্তান্ত এবং অংশত বিশ্লেষণের সূত্র পাওয়া গেলেও উত্তর-আধুনিকবাদী নির্মাণ হিসেবে এর বিশ্লেষণের লক্ষ্যে প্রয়োজন হয় আরো গভীর পাঠের, নিবিষ্ট মনোযোগের। 'গরীব কৃষকের বংশধর' যে 'আমরা', অর্থাৎ বাংলাদেশী জাতীয়তার পরিচয়ধারীরা তাদের উত্থান-পতন, তাদের সামাজিক এবং বিশেষত রাজনৈতিক সম্পর্কের সূত্রসমূহের পরিবর্তনে ইতিহাসের গভীর ও তাৎপর্যমণ্ডিত এক চোরাস্রোত এই উপন্যাসের প্রেমঘটিত ও ক্ষমতাজনিত সম্পর্কসমূহের গল্পগুলো ছাপিয়ে একে হিস্টোরিগ্রাফিক মেটাফিকশন[৫] হিসেবে পাঠ করতে পাঠককে উদ্বুদ্ধ করে। ক্ষমতা ও মান্যতায় সুহাসিনীর যে মফিজুদ্দিন মিয়া ঐ লোকালয়ে বিস্ময় ও কিংবদন্তি সৃষ্টিকারী 'আততায়ীদের হাতে ভাদ্র মাসের এক মেঘহীন পূর্ণিমা রাতে' 'সপরিবারে নিহত হওয়ার' পর গ্রামবাসী এই 'ঘটনার আকস্মিকতার বিস্ময় কাটিয়ে উঠতে পারে না' এবং এই 'রাতের ঘটনা একটি দূরবর্তী দুঃস্বপ্নের মতো ভেসে থাকে'। কেবল তা-ই নয়–

> তারা (গ্রামবাসীরা) কেবল এই বিষয়টি ভেবে বিস্মিত হতে থাকে যে, মফিজুদ্দিন মিয়া কি করে মারা যেতে পারে, এ রকম তো হওয়ার কথা ছিল না, তার তো ১১১ বৎসর বেঁচে থাকার কথা ছিল এবং তার বয়স তো মাত্র ৮১ বৎসর হয়েছিল বলে তারা জেনেছিল।[৬]

সুহাসিনীর মফিজুদ্দিন মিয়ার সপরিবারে নিহত হবার ঘটনা এবং এই ঘটনার আকস্মিকতায় গ্রামবাসীর বিস্ময়-বিমূঢ়তা ও আলোচ্য হিসেবে এই উপন্যাসের উদ্ধৃত অংশে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সপরিবার শহিদ হওয়ার পর এদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর দুঃস্বপ্নবৎ বিস্ময় এবং এই ঘটনার অন্তরালের রহস্য সম্পর্কে বিহ্বলতা ও দ্বিধাগ্রস্ততাই যেন প্রকাশ পায়। জনমুখিতা, সাংগঠনিক দক্ষতা, দূরদর্শিতা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সাহস আর দৃঢ়চেতা মনোবলের মাধ্যমে বাংলার এক সাধারণ পরিবারের যে সন্তান হয়ে উঠেছিলেন বাঙালির স্বপ্ন-আশা-স্বাধীনতার প্রতীক, সুহাসিনীর মফিজুদ্দিন মিয়া যেন তাঁরই ছায়া। তাই (তোরাপ আলির বয়ানে) মফিজুদ্দিন মিয়া জোর দিয়ে বলতে পারে–

> যে জিনিস ঝইরা পড়ে তোরাপ, তা হইত্যাছে জেবন, এই হাত থেইক্যা যা ঝইরা পড়ে তা হইলো ত্যাজ; আমার এই বাড়ি আর এই গেরামে আমি কি জেবন আর ত্যাজের আবাদ করি নাই?[৭]

'ত্যাজ' প্রেরণার সমার্থক এখানে। সুহাসিনীতে হাট বসানো, খাল কাটার কাজ মফিজুদ্দিনের নির্দেশমাত্রই সম্পাদিত হয়। ইচ্ছা আর জেদের কাছে হার-না-মানা মফিজুদ্দিনকে উপন্যাসে কেবল মানবিক প্রশ্নেই নমনীয় হতে দেখা যায়, অন্তত দুলালির মৃত্যুর পর। ক্ষমতাকে ক্ষমতা দিয়ে, কৌশলকে কৌশল দিয়ে প্রতিহত করা মফিজুদ্দিন প্রকৃতপক্ষেই তার বাড়ি ও গ্রামে ত্যাজ-

এর আবাদ করেছেন – বাংলাদেশ ও এই ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতিতে যেমনটি করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মূলত ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি উপনিবেশ হিসেবে শাসিত ও শোষিত বাঙালিকে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সৃষ্টিতে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তি হয়ে ওঠেন শেখ মুজিবুর রহমান।

রায়গঞ্জ যখন থানা থেকে উপজেলায় পরিণত হয় তখন সবার মঙ্গলার্থে মফিজুদ্দিন নতুন এই উপজেলার চেয়ারম্যান হবার দৃঢ় ইচ্ছের কথা জানান দিয়ে সুহাসিনীতে দীর্ঘদিন ধরে সম্পাদিত তার কাজের কথা গ্রামবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলে–

> ...এইখানে যখন কেউ পারে নাই তখন এই জেলা বোর্ডের রাস্তার উপুর এই গেরামের মাইনষের অনেক কিছু করি নাই? দশগেরামের মানুষ যখন খরায় কষ্ট পাইত্যাছিল, মাঠে ফসল আর ঘরে সুখ আছিল না, তহন এই যে গেরামের ভিতর জালের নাহাল পানি ভরা খাল, এইগুলান কি আমি খোঁড়ার ব্যবস্থা করি নাই? আমি কি তোমাগোরে দুঃখ-দুর্দশায় সক্কলের আগে খাড়া হই নাই, আর, আমি কি এই রায়গঞ্জে, এই বরমোগাছা আর তোমাগোরের সুহাসিনীর নেইগ্যা অত্যাচার সইহ্য করি নাই? গ্রামের ভিতরে কুত্তা মারার মাঠের উপুর দিয়্যা যুদি তাকাও, যুদি মাটি শুঁইক্যা দেখ তাইলে আমার শরীলের ঘামের গন্ধ কি পাওয়া যায় না?
> সুহাসিনীর লোকদের তখন কুকুর মারার মাঠের কথা মনে পড়ে এবং গ্রামের যারা প্রবীণ, তারা দেখতে পায় যে, তাদের জীবনের সমুদয় গল্পের সঙ্গে ঘাস এবং লতার মতো জড়িয়ে আছে মফিজুদ্দিন মিয়ার অস্তিত্ব।[৮]

বাংলার জনগণের স্বাধিকার লাভ ও ভোটাধিকার প্রয়োগের স্বপ্ন সুহাসিনীর বাসিন্দাদের নিয়তি ও বাস্তবতার সঙ্গে সমীকৃত হয়ে আছে এই উপন্যাসে। তাই–

> মফিজুদ্দিন একনাগাড়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন নির্বাচনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যায়। সুহাসিনীর মানুষের এই কথাটি জানা ছিল যে, মফিজুদ্দিন এক শ এগারো বছর জীবিত থাকবে, এবং যেকোনো কারণেই হোক, এ কথায় তাদের যেহেতু আস্থা জন্মে গিয়েছিল, তারা একসময় ধরে নিয়েছিল যে, মফিজুদ্দিনের এক শ এগারো বছর তাদের আর ভোট দেয়ার কোনো ব্যাপার নাই। তাদের এই জ্ঞান এবং এই জ্ঞানের যথার্থতার ধারণা নিয়ে তারা ব্রিটিশ আমলের শেষাংশ পাকিস্তানের যুক্তফ্রন্ট এবং আইউব খানের বিডি চেয়ারম্যানের কাল, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ন মাস এবং মুক্তিযুদ্ধোত্তর স্বাধীন বাংলাদেশের সময়কালের ভেতর দিয়ে পার হয়ে আসে এবং এই সুদীর্ঘকাল মফিজুদ্দিনের পরাজয়ের প্রশ্ন কখনো ওঠে নাই, কারণ, প্রথম দিকে গ্রামের লোকেরা নিজেদের আগ্রহের কারণেই তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীনভাবে নির্বাচিত করতে চাইত, পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন নির্বাচনে মফিজুদ্দিন এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে, গ্রামের মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিষয়টি গৌণ হয়ে পড়ে এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভের ধারণা তার কাছে অপমানকর বলে মনে হয়; এই সময় কখনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা গেলে পরিণতিতে প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরে পড়তে হতো।[৯]

উদ্ধৃতাংশে একদিকে সুহাসিনী তথা বাংলার মানুষের 'ভোট' অর্থে রাজনৈতিক সংস্কৃতির রূপরেখা উঠে এসেছে, অন্যদিকে প্রবল পরাক্রমশালী এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ক্ষমতাকেন্দ্রিকতা বনাম প্রতিপক্ষ ও জনসাধারণের সামাজিক ও মানসিক অধস্তনতার চিত্র উঠে এসেছে, আন্তোনিও গ্রামসির (১৮৯১-১৯৩৭) ভাষায় যা হেজিমনি বলে চিহ্নিত। আবার এক সাক্ষাৎকারে মফিজুদ্দিন চরিত্রটি 'বিভিন্ন মেজাজের জাতীয় বুর্জোয়ার চেহারাই উন্মোচিত' কি-না, প্রশ্নকর্তার এমন প্রশ্নে ঔপন্যাসিক জানান– ভিন্ন দুটি বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এই চরিত্র কল্পনা–

> চরিত্রটা মূলত সামন্ত চরিত্র। আমার তাই ধারণা। আসলে দুইটা বাস্তব ঘটনা আমি আমার কাহিনিতে জোড়া লাগাইতে চাইছিলাম। প্রথমত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিরাদাবাদ গ্রামের এক হিন্দু পরিবারের ছয় জনকে সম্পত্তির জন্য খুন করে ড্রামের ভিতরে পুরে চুন দিয়া নদীর পানিতে ফেলায়া দেওয়া হয়েছিল। মরে যাওয়ার পরে তারা ড্রামের ভিতর চুন দেওয়া মাংসের টুকরায় পরিণত হয়, বস্তুমাত্র হয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এই লোকগুলোর সকলের জীবন ছিল, একেকটা কাহিনি ছিল প্রত্যেকের। দ্বিতীয়ত আশির দশকে সামরিক শাসকের কালে আমি দেখেছিলাম কীভাবে বিপ্লবীদের পরিবর্তন হয়। আসলে একজন প্রাক্তন বিপ্লবীকে আমি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে কাজ করার সময় পাইছিলাম, তিনি একটা ভালো ডিগবাজি দিয়া এসে মন্ত্রী হয়েছিলেন। আমি অবশ্য আমার লেখায় বিষয়টা আনতে পারি নাই, লেখা আমার হিসাবের গণ্ডির মধ্যে থাকে নাই, থাকতে চায় নাই, আমার কিছু করার ছিল না, এটা আমার অক্ষমতা, ফলে একটা মফিজুদ্দিনের চরিত্র দাঁড়ায়া যায়। মফিজুদ্দিনের পরিবর্তনের সঙ্গে বিপ্লবীর বদলায়া যাওয়ার বিষয়টা মেলে নাই। আমি অবশ্য জোর করি নাই। মফিজুদ্দিন একটা গ্রামের মাতবর লোক, সে একসময় অগ্রগামী থাকে, অন্য সময় এতে বাধা দেয়। নিজে ভূমিহীনের পরিচয় থেকে সামন্ত আভিজাত্যে আসে, কিন্তু দুলালিকে গ্রহণ করে না, বলে, জোলার মেয়ে। সমাজের চলমানতা আটকায়া রাখার চেষ্টা করে। বিকাশের আকাঁড়াকে বুঝতে পারে না।[১০]

এভাবেই *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল* উপন্যাসের ক্রমভঙ্গ প্লটের ভেতর গভীর বাস্তবতাময় রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস স্তরীভূত—এই ইতিহাস সুহাসিনীর, বাংলাদেশের। তাই যে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা দিয়ে এই উপন্যাসের শুরু তা মামুলি নয়–পরিচিত। পূর্ণিমার ঘোরলাগা বয়ানে, আবর্তিত হলেও প্লটে মূলত ক্ষমতান্বেষীর দুরভিসন্ধির সঙ্গে সাধারণ জনতার বেদনাময় বিস্ময়ের সম্মিলন ঘটেছে, রহস্যময় পূর্ণিমার আলোর সঙ্গে এতে এক কালোরাতের নৃশংসতার পটভূমি যুক্ত। আর এমন ঘটনা ও বয়ন এবং বিশেষত মফিজউদ্দিন চরিত্রের নির্মাণে বঙ্গবন্ধু-চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য আরোপণের মাধ্যমে গাল্পিক নির্মাণ এই উপন্যাসের পাঠকে হিস্টোরিগ্রাফিক মেটাফিকশন হিসেবে ফলপ্রসূ করে তোলে।

চার

উত্তর-আধুনিকবাদ এর তত্ত্বগুচ্ছের বিবিধ ছাঁচে একই ঘটনা, চরিত্র বা বিষয়কে পরীক্ষা করতে প্রণোদিত করে। তাই সুহাসিনীর মফিজুদ্দিনের সপরিবার নিহত হবার ঘটনা কেবল ঐতিহাসিক ফ্রেমে বিশ্লেষ্য নয়, এর রয়েছে ভিন্নতর ভাষ্যও। সুহাসিনীর বর্ষীয়ান অভিভাবকতুল্য মফিজুদ্দিনের হত্যাকাণ্ডে তাই স্মরণ করা যেতে পারে বাইবেল-বর্ণিত আদিপাপের আর্কেটাইপকে। এজন্যই চরাচর-প্লাবিত জ্যোৎস্নায় এই লোকালয়ের বাসিন্দাদের ঘোর লাগে, তাদের চিত্ত চঞ্চল হয়, শান্তি খুঁজে পায় না তারা। তাদেরই একজনের চাঁদের আলোকে মনে হয় 'যানি চান্দের আলো না', সে অনুভব করে যেন পানির মধ্যে ভেসে ওঠে, আর তার হাত-পা-শরীর হাল্কা হয়ে যায়, নেশার মতো লাগে। তখন সে বলে–

> আমি আমার দোস্তো বাহের তালুকদারের নাম ধইর‍্যা চিক্কুর দিয়্যা উঠি, ওই বাহের, বাহের রে; কেন যে এই রহম চিক্কুর দেই, কইব্যার পারি না, এমনি দেই; ছাওয়াল-পাওয়াল যেমন বৃষ্টি দেইখলে নাপ পাড়ে, আমারও তেমনি ওই চান্দের আলোয় চিক্কুর দিব্যার ইচ্ছা করে আর আমি চিক্কুর দিয়া ওঠি;[১১]

এই আচরণ আদিপাপের প্রায়শ্চিত্তবৎ, দৃশ্যমান একজনের হয়েও সামষ্টিক। উপন্যাসে আর্কেটাইপের প্রয়োগ আরও স্পষ্ট আকালুর বোবা স্ত্রী তথা মফিজুদ্দিন মিয়ার মায়ের আখ্যানে:

ধানক্ষেতে কুড়িয়ে পাওয়া বোবা মেয়ে শিশুটি আকালুর ঘরে প্রতিপালিত হয়। তারপর গ্রামবাসী তাকে আকালুর সন্তানের মা হিসেবে অপ্রস্তুতভাবে গ্রহণ করে। এই গ্রামের লোকদের কাছে এই বোবা নারীর আগমন সম্পর্কিত ঘটনা বিভ্রান্তির ভেতরেই থেকে যায়, যদিও একবার আকালু জানায়–

> মেয়েটি আসলে মাটির ভেতর থেকেই উঠেছে, মাটি ফুঁড়ে প্রথমে তার মাথাটি বের হয়ে আসে, এই সময় সে মেয়েটিকে দেখে এবং মাটি খুঁড়ে বের করে আনে; সে বলে, ক্যা মাটির ভিতর থেইক্যা গাছ যুদি উইঠপার পারে, তাইলে মানুষ উইঠলেও উঠপার পারে।[১২]

এই বর্ণনাংশ খুব স্বাভাবিকভাবেই পাঠককে নিয়ে যায় ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত সীতা-কাহিনির কাছে। ভারতবর্ষে আর্যায়নের প্রধান বৈশিষ্ট্য কৃষি সভ্যতার। জনক রাজার লাঙলে সীতার উত্থান *রামায়ণে* সেই সভ্যতারই ইঙ্গিতবাহী ঘটনা। কৃষক-সন্তান মফিজুদ্দিনের গোত্রপতি হওয়া তথা সাধারণ সামন্তীয় পরিবারের সন্তান থেকে রাজনীতিসূত্রে একটি রাষ্ট্রের পত্তন করা বাঙালি জাতির জনকের উত্থান-ইতিহাস উক্ত আর্কেটাইপকে বহন করে বাস্তব হয়ে ওঠে।

পাঁচ

আগের অনুচ্ছেদে বর্ণিত, আলোচ্য আর্কেটাইপ ঔপন্যাসিকের পূর্ব-ধারণা থেকে গৃহীত। সেই ধারণার উৎস *রামায়ণ*। উল্লেখ প্রয়োজন, *রামায়ণ* ভারতবর্ষীয় পুরা-ইতিহাস; যা আদিতে মৌখিকভাবে প্রচলিত থাকলেও পরে নানাজনের হাতে লিখিত ও পুনর্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ মফিজুদ্দিনের বোবা মায়ের চরিত্র-কল্পনায় এই উপন্যাসে ইন্টারটেক্সচুয়াল[১৩] উপাদানের উপস্থিতি লক্ষণীয়। কেবল *রামায়ণ* নয়, গ্রন্থ-শিরোনামে ও বয়ানে 'চন্দ্র' প্রসঙ্গ শহীদুল জহিরের পাঠককে বাংলা সাহিত্যের শক্তিমান সাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কাছে নিয়ে যায়; তাঁর *চাঁদের অমাবস্যা* উপন্যাস পাঠের স্মৃতিকে জাগরূক করে তোলে। প্রসঙ্গত দেখে নেয়া যেতে পারে *চাঁদের অমাবস্যা* উপন্যাসের শুরুটা–

> শীতের উজ্জ্বল জ্যোৎস্নারাত, তখনো কুয়াশা নাবে নাই। বাঁশঝাড়ে তাই অন্ধকারটা তেমন জমজমাট নয়। সেখানে আলো-অন্ধকারের মধ্যে যুবক শিক্ষক একটি যুবতী নারীর অর্ধ-উলঙ্গ মৃতদেহ দেখতে পায়। অবশ্য কথাটা বুঝতে তার একটু দেরি লেগেছে, কারণ তা ঝট্ করে বোঝা সহজ নয়। পায়ের ওপর এক ঝলক চাঁদের আলো। শুয়েও শুয়ে নাই। তারপর কোথায় তীব্রভাবে বাঁশি বাজতে শুরু করে। যুবতী নারীর হাত-পা নড়ে না। চোখটা খোলা মনে হয়, কিন্তু সত্যিই হাত-পা নড়ে না। তারপর বাঁশির আওয়াজ সুতীব্র হয়ে ওঠে। অবশ্য বাঁশির আওয়াজ সে শোনে নাই।[১৪]

অপরদিকে *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল* উপন্যাসের শুরু–

> গ্রামের লোকদের সে রাতের চাঁদের কথা মনে পড়ে এবং তারা সেই চাঁদের বর্ণনা দেয়। আততায়ীদের হাতে ভাদ্র মাসের এক মেঘহীন পূর্ণিমা রাতে সুহাসিনীর মফিজুদ্দিন মিয়া সপরিবারে নিহত হওয়ার পরদিন, গ্রামবাসীদের কেউ কেউ মহির সরকারের বাড়ির প্রাঙ্গণে এসে জড়ো হয়...এবং তাদের শুধু পূর্ণিমার সেই চাঁদের কথা মনে পড়তে থাকে। তখন হুঁকোর গুড়গুড় শব্দ এবং খামিরা তামাকের গন্ধের ভেতর ডুবে থেকে তোরাপ আলি কথা বলে, সে বলে যে, আগের দিন সন্ধের সময় সে রাস্তার কিনারায় বেঁধে রাখা গরুর বাছুর ঘরে আনছিল; সে বলে, আমি পরথমে বুইজব্যার পারি নাই, শরীলের মইদ্দে কেমুন যানি ভাব হইবার নিছিল, কেমন যানি ঘোরঘোর নেশার নাহাল, চাইর দিকে কেমন যানি ধুলা ধুলা, কিন্তু ধুলার ভিতরে কেমন যানি ভাব,

> কেমন যানি রঙের নাহাল ছড়ায়া আছে ; আমি তো বুজি না কি, খালি বুজি কিছু একটা ; তার বাদে যহন ম্যাবাড়ির সামনে আইছি তহন বুইজব্যার পারি আসলে কি ; দেহি কি ম্যাবাড়ির মাথাভাঙা আম গাছটার ডাইন পাশ দিয়া পুন্নিমার চান ভাইসা উইঠছে। গ্রামবাসীদের সকলের এই চাঁদটির কথা মনে পড়ে এবং মহির সরকারের উঠোনে বসে তারা বলে যে, তাদের মনে হয়েছিল যেন এক ছিন্ন মুণ্ডুর মতো রক্তাক্ত চাঁদ গ্রামের মাথার উপর দিয়ে গড়িয়ে যায়। অমাবস্যার অন্ধকারের বদলে আততায়ীরা কেন পূর্ণিমার চন্দ্রালোকিত রাতকে বেছে নেয়, তা গ্রামবীসারা বুঝতে পারে না;[১৫]

দুটি উপন্যাসেই মোহগ্রস্ত পূর্ণিমার বর্ণনার ভেতর দিয়ে হত্যাকাণ্ডের ঘটনার কথা বলা হয়েছে। দুই উপন্যাসেই 'পূর্ণিমা'র ইমেজের প্যারাডাইম-শিফট[১৬] ঘটেছে। ওয়ালীউল্লাহ্ উপন্যাসের নামকরণে 'অমাবস্যা' ব্যবহার করে এই প্যারাডাইম-শিফটকে ইঙ্গিতবাহী করলেও জহির তা না করে ব্যাপারটিকে আরো তির্যকভাবে নির্মাণ করেছেন। ওয়ালীউল্লাহ্ যেখানে ব্যক্তিচৈতন্যের সহায়তা নিয়ে বর্ণনা সম্পাদন করেছেন, জহির সেখানে নিয়েছেন সামষ্টিক চৈতন্যের আশ্রয়। *চাঁদের অমাবস্যার* ঔপন্যাসিক ইয়োরোপীয় দর্শনজাত অস্তিত্বজিজ্ঞাসাকে গ্রামীণ পটভূমিতে স্থাপন করেছিলেন এবং বয়নে প্রাধান্য দিয়েছিলেন মনোলগকে। *সে রাতে পূর্ণিমা ছিলর* ঔপন্যাসিক এই ভূখণ্ডের মানুষের চেনা ইতিহাসকে অপরিচিতকৃত আকারে হাজির করেছেন মহির সরকারের বাড়ির উঠোনে বসা এক বৈঠকে, তোরাপ আলির কথনে –যা স্মরণ করিয়ে দেয় হাজার বছরের বাংলার পুথিপাঠ-সংস্কৃতিকে। তোরাপ আলি যেন সেই শোকাবহ পুথির বয়নকারী আর সেই বৈঠক যেন পুথিপাঠের আসর; সমবেত সকলে এই শোকের ধারক ও সেই বয়ানের মুগ্ধ শ্রোতা। কেবল ওয়ালীউল্লাহ্ নয়, শহীদুল জহিরের এই উপন্যাস-পাঠে মার্কেসের *নিঃসঙ্গতার একশ বছর* টেক্সটের সঙ্গেও খানিক সাদৃশ্য আবিষ্কৃত হয়। চঞ্চল আশরাফের এক লেখায় *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল* উপন্যাসের সঙ্গে মার্কেসের টেক্সটের সাদৃশ্যের কথা এসেছে। তিনি লিখেছেন–

> *মার্কেজের হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচ্যুড*-র শুরু ফায়ারিং স্কোয়াড থেকে এবং এর পর দীর্ঘ ফ্ল্যাশব্যাক; *সে রাতে পূর্ণিমা ছিলতেও* তেমনটিই : মফিজুদ্দিনের সপরিবারের নিহত হওয়ার পর থেকে তার জন্মকাহিনী, কৈশোর ও যৌবন, বৃদ্ধাবস্থা ও খুন হওয়ার মধ্য দিয়ে সর্বাংশে পতন এক দীর্ঘ ফ্ল্যাশব্যাকে গ্রামবাসীর স্মৃতির সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। সময় সব সময় তাতে এগোয় না; দূর-অতীত বর্তমানের প্রতিটি মুহূর্তে হাজির হয়ে থাকে; আর ভবিষ্যৎ অলরেডি হ্যাপেন্ড।[১৭]

আলোচ্য উপন্যাসের অন্যত্র প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিত মল্লনাগ বাৎস্যায়ন (আনু. ৪র্থ-৬ষ্ঠ শতক) রচিত *কামসূত্র* গ্রন্থ ও এর বিষয়বস্তুর কথা গণিকা নারীর কথায় উঠে এসেছে–

> ...সে হালাকু এবং জোবেদকে বলে যে, তার বয়স যখন আরো কম ছিল তখন সে একবার কোলকাতায় ছিল, এখন সেখানে সে কিছু লেখাপড়া শেখে এবং বাৎসায়নের বই পড়ে; কামসূত্রের নাম শুইনছ? সে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে। তার কথা শুনে হালাকু হা করে থাকে, নষ্ট মেয়েটির উচ্ছ্বসিত স্খলিত হাসি পানির শব্দের পাশাপাশি যমুনার বুকের ওপর দিয়ে বয়ে যায়; হালাকুর ফাঁকা নির্বোধ চাউনির দিকে তাকিয়ে সে বলে যে, সে চৌষট্টি কলা জানে এবং এ বিষয়ে হালাকু এবং জোবেদের মূর্খতার কথা বলে তাদেরকে বিভ্রান্ত এবং লোভী করে তোলে; তোমরা এই মজার কিচ্ছু জান না, সে বলে, বাৎসায়ন এই কামের নেইগা আশিটা আসনের কথা লেইখ্যা গেছে; এবং তারপর বলে যে, সে তাদেরকে এই সবই শেখাবে যদি তারা অপেক্ষা করে...।[১৮]

ছয়

আইরনি ও ব্ল্যাক হিউমার উত্তর-আধুনিক কথাসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ।[১৯] বাৎস্যায়নের টেক্সটসূত্রে ঔপন্যাসিক গণিকা নারীর রহস্যময় ও ছলাকলাপূর্ণ কৌশলের মাধ্যমে মাত্রাতিরিক্ত রতিক্রিয়ার ফলে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণজনিত কারণে দুই ডাকাতের মৃত্যুদৃশ্য রচনা করেন। এই দুই মৃত্যুদৃশ্যে আইরনির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। উল্লেখ থাকে যে, উত্তর-আধুনিক আখ্যানের অন্যতম প্রকাশ-বৈশিষ্ট্য এই আইরনি। উপন্যাসে যখন গণিকা মেয়েটি জোবেদকে জানায়–

> তার বন্ধু হালাকু খুব দুর্বল পুরুষ ছিল, সে তার কাজ শেষ করার আগেই মারা গেছে, এখন তাই কামসূত্রের অবশিষ্ট আসনগুলো সম্পর্কে জানার দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে; কারণ, সে-ই হালাকুর চাইতে সমর্থ পুরুষ।[২০]

তখন, হালাকুর মৃত্যুসংবাদে পাঠক বিচলিত বা ভারাক্রান্ত হয় না। বরং জোবেদের আসন্ন মৃত্যু সম্পর্কে এক অমোঘ প্রতীক্ষার চক্রে প্রবেশ করে। মফিজুদ্দিনের মতে গণিকা নারীর এই মৃত্যুময় রহস্যক্রীড়া তাকে বাঁচানোর চেষ্টামাত্র। উপন্যাসের পাঠকও এই সত্য উপলব্ধি করে মফিজুদ্দিন ও গণিকা নারীটির প্রতি পক্ষপাতমূলকভাবে সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে; আর রতিক্লান্ত মৃত দুই ডাকাত হালাকু ও জোবেদের এই পরিণতিতে ঔপন্যাসিকের বর্ণনা ও পাঠকের প্রত্যাশার যোগাযোগে ব্ল্যাক হিউমার সৃষ্টি হয়।

সাত

উপন্যাসে জাদুবাস্তববাদের রূপকার হিসেবে শহীদুল জহির বাংলা সাহিত্যে বিশেষভাবে পরিচিত। তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পের গুরুত্বপূর্ণ দিক এটি নিঃসন্দেহে। আলোচ্য উপন্যাসে অন্তত দুটি বর্ণনায় জাদুবাস্তববাদের প্রকাশ লক্ষণীয়—একটি তোরাপ আলির ভাষ্যে নির্মিত, অপরটি দুলালির মৃত্যু-পরবর্তী পরিস্থিতিতে সৃষ্ট। সপরিবার ভাদ্র মাসের ঘোরলাগা পূর্ণিমা রাতে মফিজুদ্দিন মিয়া নিহত হবার পরদিন মহির সরকারের উঠোনে সমবেত 'তর্কের অনুপযুক্ত' সময়ে শ্রোতাগণ 'বিভ্রান্তিসহ নীরবে বক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করে'। তখন ভূতপূর্ব নরসুন্দর তোরাপ আলি একদিন মফিজুদ্দিন মিয়ার চুল কাটার ঘটনার স্মৃতিমূলক বর্ণনা প্রদান করে–

> ...সেই মুহূর্তে তার সামনে সে অসাধারণ একটি করতল প্রসারিত দেখতে পায়; মহির সরকারের উঠোনে জড়ো হওয়া কৃষকদের নির্লিপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলে, আমার ওস্তাদ শিখাইছিল যে, মাইনষের জীবনের উপুর ভর কইর‍্যা থাকে চাইরটা জিনিস, এ্যার একটা হইলো সূরযো, তার বাদে চান, মঙ্গল আর শনি; মাইনষের হাতে থাকে এই চাইর জনের রাজত্বের হিসাব, যুদি শনির রাজত্ব বাইড়া যায় তাইলে বাণিজ্যের নাও মাইর খায়, ফসলে পোকা হাঁটে, আন্ধারে পেঁচা ডাইক্যা ওঠে, আসে দুর্দিন; তবে সূরযের রাজত্ব যুদি বড় থাকে তাহইলে সাহস থাকে কইলজা জোড়া, আর তাইলে শনি কাবু হয়্যা থাকে; আর মঙ্গল যুদি রাজা হয় তাইলে সব ভালো; কিন্তু চান্দের রাজত্ব যুদি বড় হয় তাইলে কি হয় ওস্তাদ? আমি জিজ্ঞাস করি, আমার ওস্তাদ কয়, এ্যার কোনো ভালো-মন্দ নাই, কিম্বা এইটা ভালো-মন্দ দুই-ই; চান্দের আলো যহন ফেরেশতারা পিরথিবীতে ঢাইল্যা দেয়, তহন বিরিক্ষ আর পশুপাখির পরান নিঝঝুম হয়্যা আসে, তহন চান্দের রাজত্বে যে যায় সে কইতে পারে না, সে জাইগা না ঘুমায়া আছে, সে য্যান খালি এক নেশার ভিতর দিয়া হাঁইট্যা যায়; এই কথা কইছিল আমার সেই ওস্তাদ; আর সেইদিন ম্যাবাড়ির উঠানে গাবগাছের ছায়ায় চিৎ কইর‍্যা রাখা ম্যাসাবের হাতের জমিনে আমি সূরযের রাজত্ব বড় শক্ত দেখি, কিন্তু তার হাতের তালুত তার চাইতে বড় আছিল চান্দের পাহাড়। তোরাপ আলি বলে যে, মফিজুদ্দিন মিয়ার করতলের রেখা দেখে বহুদিন পূর্বে সেই দুপুরে সে ভয়ানক চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, কারণ সে বলে যে, মানুষের হাতের রেখা আঙুলের দিক থেকে কব্জির দিকে নেমে আসে, কিন্তু

> মফিজুদ্দিন মিয়ার হাতের রেখাগুলো কব্জির কাছাকাছি স্থানে জটলাবদ্ধ ছিল এবং এই জট থেকে তিনটি পাকানো দড়ির মতো রেখা আঙুলের দিকে প্রবাহিত হয়ে, কনিষ্ঠা ও অনামিকা, অনামিকা ও মধ্যমা এবং মধ্যমা ও তর্জনীর মাঝখানের গর্তে পতিত হয়েছিল। তোরাপ আলি বলে যে, মফিজুদ্দিন মিয়ার করতলের রেখাগুলোর, হাতের আঙুল বেয়ে নিচের দিকে নেমে যাওয়ার এই দৃশ্যে তার এক অস্বস্তিকর অনুভূতি হয়েছিল, তার কেমন ভয় লেগেছিল যেন; সে বলে, আমি চুল কাটা থামায়া তাকায়া থাকি, জিজ্ঞাস করি, ম্যাসাব আপনের হাতের রেখাগুলান এই রকম ক্যা? ম্যাসাব বিরক্ত হয় নাকি আমার কথা শুইন্যা, তা বুজিবার পারি না, কেমন গম্ভীর হয়্যা কয়, কি রকম? আমি সাহস রাইখ্যা কই, কেমন যানি গড়ায়া পইড়ত্যাছে, কি যানি বায়া পইড়ত্যাছে জমিনের দিকে মনে হয়।[২১]

গ্রামের প্রাক্তন এই নাপিত জ্যোতিষবিদ্যা জানে বলে তারা (শ্রোতারা) স্মরণ করতে পারে না। মূলত প্রশ্নহীন, তর্কহীন, বিশেষ পরিস্থিতি, সম্মোহন, সামষ্টিক বিশ্বাস, গুরু-বিদ্যা বা গুপ্তবিদ্যার আশ্রয়ে বয়ান ও এর গ্রহণযোগ্যতা এ-সবই জাদুবাস্তববাদী আখ্যানের বৈশিষ্ট্য, যা এই বর্ণনাংশ ধারণ করেছে। উপন্যাসের অন্যত্র দুলালির মৃত্যুর তৃতীয় দিন যখন লাশের পচা গন্ধ গ্রামবাসী পায় না বরং বালিকার 'মুখটি চিনেমাটির তৈজসের মতো চকচক করে' তখন গ্রামের লোকেরা—

> এই বিষয়টি বুঝতে পারে যে, এই শব ক্ষয় হতে দেরি হবে এবং মোবারক আলি অথবা মফিজুদ্দিন মিয়ার একজন যদি আপস না করে, তাহলে লাশ হয়তো অনন্তকাল ধরে মাটির ওপরেই থেকে যাবে, কবর দেয়া হবে না...তারা যখন বুঝতে পারে যে, এই লাশে পচন শুরু হতে দেরি হবে, তারা মোবারক আলিকে আর চাপ না দিয়ে, মোল্লা নাসিরুদ্দিনকে যাতে ডেকে আনার ব্যবস্থা করা হয়, সে উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র শুরু করে।[২২]

মৃতের ইচ্ছে বা উইশ-সংক্রান্ত লোকবিশ্বাস ও লোকশ্রুতির প্রতিফলন ঘটেছে এই বর্ণনাংশে। সামষ্টিক চৈতন্য, বিশ্বাস ও ক্রিয়ার যে সম্মিলন এখানে রয়েছে তা জাদুবাস্তববাদের প্রচলিত তথা স্বীকৃত বৈশিষ্ট্যের অনুগামী। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় জাদুবাস্তববাদের সফল রূপকার ল্যাতিন আমেরিকান সাহিত্যিক গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের কথা। তিনি ল্যাতিন পরিমণ্ডলের বিশ্বাস-আচারকেই তাঁর এই প্রকরণের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন বলে অনেক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন। তাই তাঁর 'সরলা এ্যরেন্দিরা আর তার নিদয়া ঠাকুমার অবিশ্বাস্য করুণ কাহিনী'র নায়ক উলিসিস যখন এরেন্দিরার প্রেমে পড়ে, তখন তার স্পর্শে যেকোনো বস্তু রঙিন হয়ে উঠছিল। আর এটা দেখেই তার মা ছেলের প্রেমে পড়ার বিষয়টি বুঝতে পেরেছিল। উল্লেখ্য, ল্যাতিন আমেরিকার লোকবিশ্বাসের প্রতিফলনেই প্রেমিক-শনাক্তকরণের এই বয়ন তৈরি হয়েছিল মার্কেজের হাতে। বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষীয় লোকবিশ্বাস এরকম— মৃত ব্যক্তির অপূর্ণ বা শেষ ইচ্ছের অপূরণে তার আত্মা অতৃপ্ত থাকে, তার অশুভ প্রত্যাবর্তন ঘটে, তার লাশ সৎকার করা যায় না বা এতে গ্রামবাসীর অমঙ্গল হয়; কিংবা তার শেষ ইচ্ছে মৃত্যুর পর পূরণ করলে পুণ্য হয় প্রভৃতি। শহীদুল জহির দুলালির অপমৃত্যু, তার অপূর্ণ ইচ্ছে, লাশের অপচনশীলতা এবং গ্রামবাসীর বিশ্বাস ও তৎপরতায় উপর্যুক্ত বর্ণনাংশে এই ভূখণ্ডের লালিত তথা আচরিত উপাদান-সহযোগে জাদুবাস্তবতা নির্মাণ করেছেন।

আট

ডিফেমিলারাইজেশন বা অপরিচিতকরণ উত্তর-আধুনিক সাহিত্যের অনিবার্য দিক। কারণ, কেন একটি টেক্সটকে পূর্ববর্তী টেক্সট থেকে 'পৃথক' বলা হবে, এর উত্তর প্রদান করে এই বৈশিষ্ট্য।

পুরানো শিল্পের নির্যাস নিয়ে একে ভিন্নমাত্রা প্রদান করেও উত্তর-আধুনিক শিল্পের শেকড়ায়ন ঘটানো হয়, তবে তা হয়ে ওঠে পূর্ববর্তী শিল্প থেকে ভিন্ন। উত্তর-আধুনিক সাহিত্য বিশ্লেষণে অতীত থেকে রূপ-রীতি আহরণ করে নতুনভাবে সৃষ্টি তথা অবিনির্মাণ করার পরিভাষা হলো রেট্রো (retro)। এর মূল রিস্টোরেশন। এটি মূলত সাহিত্যের পুনর্জীবন প্রদানকারী প্রক্রিয়া। এই উপন্যাসে ঐতিহাসিক ঘটনার অপরিচিতিকৃত অবিনির্মাণে উপন্যস্ত আখ্যান-উপখ্যানে অনেকগুলো নাটকীয় উপাদান ঔপন্যাসিককে যুক্ত করতে হয়েছে। তদ্‌মধ্যে উপন্যাসের প্রারম্ভ থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত দেশজ নাট্যরীতির অনুসরণ লক্ষণীয়।[২৩] এই অনুসরণ পুথিপাঠের রীতি-সংস্কৃতিজাত বা তারও পূর্বের যাত্রা কিংবা নাটকের সূত্রধারের ভূমিকাজাত। এই উপন্যাসে সেই সূত্রধার কিংবা পুথি-পাঠক হলো তোরাপ আলি। সে মহির সরকারের বাড়ির বাইরের উঠোনে জড়ো হওয়া গ্রামবাসীকে অকস্মাৎ ঘটে যাওয়া মর্মন্তুদ ঘটনার লৌকিক-অলৌকিক কার্যকারণ বয়ান করে। আর গ্রামবাসী তার বর্ণনা ও ব্যাখ্যার সঙ্গে তাদের আবেগ, কল্পনা ও অনুভূতির যোগাযোগ সৃষ্টি করে। এভাবেই পূর্বকালে পুথির শ্রোতা বা যাত্রার দর্শকগণ তাদের সামনে উপস্থাপিত বিষয়াদির স্বাদ গ্রহণ করতো। উপন্যাসে এই উপস্থাপন-মাধ্যম হলো বয়ানকারীর ভাষা। এই ভাষা সর্বজ্ঞ লেখকের বয়ান থেকে চরিত্রের বয়ানের পার্থক্য তৈরির মাধ্যমে যেমন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে, অপরদিকে তা ‘বহুবাস্তব-সমন্বিত দুনিয়াকে সংলাপায়িত’ও[২৪] করেছ। উল্লেখ্য,

> রচয়িতার দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, বহুবাস্তব সমন্বিত বাস্তবতায় বিদ্যমান ভাষাগুলোর জুতসই ইমেজ তৈরি করা এবং এমনভাবে উপস্থাপন করা যেন তাদের বহুমাত্রিক পারস্পরিকতা সম্ভব হয়। বাখতিনের সাহিত্য বাস্তবের হুবহু অনুসরণ নয়, কিন্তু শৈল্পিক বাস্তব আর অনুকৃত বাস্তবের পারস্পরিকতা তাতে রক্ষিত হবে।[২৫]

আলোচ্য উপন্যাসের শুরু সর্বজ্ঞ ঔপন্যাসিকের বয়ানে; ক্রমে তা উপন্যাসের চরিত্রসমূহের বাস্তবতাকে নির্মাণপূর্বক উপন্যাসের এক চরিত্রের উক্তির ভেতর প্রবেশ করে। তারপর আবার তা বয়ান পরিবর্তন করে। এভাবে ঔপন্যাসিক বহুবাস্তব সমন্বিত দুনিয়াকে শৈল্পিকভাবে সংলাপায়িত করেন–

> গ্রামের লোকদের সে রাতের কথা মনে পড়ে এবং তারা সেই চাঁদের বর্ণনা দেয়। আততায়ীদের হাতে ভাদ্র মাসের এক মেঘহীন পূর্ণিমা রাতে সুহাসিনীর মফিজুদ্দিন মিয়া সপরিবারের নিহত হওয়ার পরদিন, গ্রামবাসীদের কেউ কেউ মহির সরকারের বাড়ির প্রাঙ্গণে এসে জড়ো হয়।...মহির সরকারের বাড়ির উঠোনে তারা নির্বাক হয়ে হুঁকো টানে এবং তাদের শুধু পূর্ণিমার সেই চাঁদের কথা মনে পড়তে থাকে। তখন হুঁকোর গুড় গুড় শব্দ এবং খামিরা তামাকের গন্ধের ভেতর ডুবে থেকে তোরাপ আলি কথা বলে, সে বলে যে, আগের দিন সন্ধ্যের সময় সে রাস্তার কিনারায় বেঁধে রাখা গরুর বাছুর ঘরে আনছিল; সে বলে, আমি পরথমে বুইজব্যার পারি নাই, শরীলের মইদ্দে কেমুন যানি ভাব হইবার নিছিল, কেমন যানি ঘোরঘোর নেশার নাহাল, চাইর দিকে কেমন খানি ধুলা ধুলা, কিন্তু ধুলার ভিতরে কেমন খানি ভাব, কেমন যানি রঙের নাহাল ছড়ায়া আছে; আমি তো বুজি না কি, খালি বুজি কিছু একটা; তার বাদে যহন ম্যাবাড়ির সামনে আইছি তহন বুইজব্যার পারি আসলে কি; দেহি কি ম্যাবাড়ির মাথাভাঙ্গা আম গাছটার ডাইনে পাশ দিয়্যা পুন্নিমার চান ভাইসা উইঠছে। গ্রামবাসীদের সকলের এই চাঁদটির কথা মনে পড়ে এবং মহির সরকারের উঠোনে বসে তারা বলে যে, তাদের মনে হয়েছিল যেন এক ছিন্ন মুণ্ডুর মতো রক্তাক্ত চাঁদ গ্রামের মাথার উপর দিয়ে গড়িয়ে যায়।[২৬]

নয়

উত্তর-আধুনিকবাদ শহীদুল জহিরের বর্তমান আলোচ্য উপন্যাসসহ সব রচনায় এদেশীয় সমাজ-সংস্কৃতির গভীরে শেকড়ায়িত হয়ে সাহিত্যরূপ গ্রহণ করেছে। এই জাতির গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বয়নকে উপস্থাপনের জন্য তিনি নতুন ভাষা ও কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, পরিচিত পটভূমিকে সাযুজ্যপূর্ণ অথচ অপরিচিত গল্পের মোড়কে হাজির করেছেন। তাই তত্ত্বীয় আরোপে তা ভারবাহী নয়, তত্ত্বীয় নবরূপায়ণে তা প্রাণবাহী। একটি জাতির বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা ও ঘটনাপুঞ্জকে উপন্যাসায়নের সফল প্রকল্প *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল*। অনেকান্ত পাঠের সূত্র ও সম্ভাব্যতায় উপর্যুক্ত আলোচনার উপসংহারে এই টেক্সটকে বাংলাদেশের সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ উত্তর-আধুনিকবাদী টেক্সট হিসেবে অভিহিত করা চলে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ একটি তত্ত্ব হিসেবে উত্তর-আধুনিকবাদ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) পরবর্তী বিশ্বে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-নৈতিক-সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক বিপর্যয় ও সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত। অর্থাৎ অদ্যাবধি ক্রিয়মাণ এই তত্ত্বের বয়স প্রায় পৌনে এক শতাব্দী। উল্লেখ্য, উত্তর-আধুনিকবাদের চর্চার শীর্ষতম সময় ছিল পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহে বিশ শতকের সত্তরের দশক এবং বাংলাদেশে নব্বইয়ের দশক। তত্ত্ববেত্তাগণ এই তত্ত্বকে তীব্র অভিযোজনক্ষম তত্ত্ব হিসেবে বিবেচনা করেন।

২ শহীদুল জহিরের সহপাঠী মোহাম্মদ আব্দুর রশীদের একটি লেখার শিরোনাম 'শহীদুল জহির : মৃত্যু যাকে জন্ম দিয়েছে' (মোহাম্মদ আব্দুর রশীদ [সম্পাদিত] *শহীদুল জহির সমগ্র*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৯০১-৯০৩)। এই লেখায় রশীদ জানিয়েছেন লেখকের স্বভাবসুলভ আত্মমগ্নতা ও প্রচারবিমুখতার ব্যাপারে। তাঁর দেওয়া তথ্যমতে প্রায় অর্ধশতাধিক দেশি-বিদেশি সমলোচক শহীদুল জহিরের সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা করেছেন (২০১৩ সাল পর্যন্ত)। বেশ কয়েকটি ছোটকাগজ, যেমন– শালুক, লোক, উলুখাগড়া, বাংলা জার্নাল (কানাডা থেকে প্রকাশিত) তাঁর মৃত্যুর পর লেখককে নিয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে। বিভিন্ন দৈনিকের সাহিত্যপাতায় তাঁর সাহিত্য নিয়ে সমালোচনা ও মূল্যায়ন প্রকাশিত হয়েছে এবং অ্যাকাডেমিক গবেষণাও হয়েছে তাঁকে নিয়ে। ক্রমে উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি হচ্ছেন পাঠ্যভুক্তও। এভাবেই নিভৃতচারী এই লেখক তাঁর মৃত্যুর পর হয়ে উঠেছেন জীবিত।

৩ কবি ও সাহিত্য-সমালোচক চঞ্চল আশরাফ বর্তমান উপন্যাসকে পাঠ করতে চেয়েছেন নিওক্রিটিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর 'উপন্যাস পাঠ : সে রাতে পূর্ণিমা ছিল' প্রবন্ধে। তিনি এর কাহিনি, এর অন্তর্গত গল্প, একক ব্যক্তির উত্থান, কাহিনির ভেতর অতিপ্রাকৃত, কাকতালীয় ও রহস্যময় ঘটনার সন্ধান শেষে একে জাদুবাস্তববাদী উপন্যাস বলা যায় কী না–তার উত্তর সন্ধান করেছেন। তবে এই পাঠ গভীর যুক্তিপূর্ণ ও বিশ্লেষণধর্মী নয়–অনেকটা বর্ণনাপ্রধান ও মন্তব্য-অনুগামী। শহীদুল জহির গবেষক শরীফ সিরাজ তাঁর এমফিল গবেষণার গ্রন্থরূপ *শহীদুল জহির : কথাসাহিত্যের বিষয়বৈচিত্র্য ও প্রকরণ (বাংলানামা, ঢাকা, ২০২৩)-এ* এই উপন্যাসকে পাঠ করেছেন মূলত বাংলাদেশের 'স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনৈতিক সংস্কৃতির চিত্র' হিসেবে। তিনি উপন্যাসের প্রথানুগ বিশ্লেষণরীতি মেনে এর কাঠামো তথা গঠন, ভাষা-পরিচর্যার ধরন বিশ্লেষণ করেছেন। আলোচ্য উপন্যাসকে নিয়ে আরো কিছু প্রবন্ধ ও প্রবন্ধাংশ রয়েছে। তবে বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্বগত দিক থেকে সে-সব উল্লেখ ততটা প্রয়োজনীয় নয়।

৪ শহীদুল জহির, *নির্বাচিত উপন্যাস*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০০৭, ব্লার্ব

৫ হিস্টোরিগ্রাফিক মেটাফিকশন (Historiographic metafiction) উত্তর-আধুনিকবাদী আখ্যানের একটি প্রকরণ, যা মূলত লিন্ডা হাচিয়েন কর্তৃক ভাবিত এবং তাঁর *A Poetics of Postmodernism* (London & New York,

Routledge, 1988) গ্রন্থে প্রকাশিত। ঐতিহাসিক ঘটনা ও ঐতিহাসিক চরিত্র এতে মুখ্য, তবে ইতিহাসের বয়ন নয়, ইতিহাসকে গল্পময় করাই এ-ধরনের উপন্যাসের উদ্দেশ্য। কারণ গল্পকে 'গল্প' আকারে প্রকাশ করার দায় থাকে উত্তর-আধুনিক এই ধারার ঔপন্যাসিকের, ইতিহাস একে অবয়ব প্রদানে সহায়ক হয়। হিস্টোরিগ্রাফিক মেটাফিকশনে 'টেমপেরাল ডিসটর্ট'-এর বহুল প্রয়োগ ঘটে থাকে। এই কৌশলের মাধ্যমে উপন্যাসে একরৈখিক সময়প্রবাহকে পরিবর্তন করা হয়। অর্থাৎ উপন্যাসে সময় প্রবাহে বিচ্যুতি বা বিকৃতি তৈরি করা, যা সাময়িক এবং পাঠকের মধ্যে বিভ্রম তৈরি হতে সাহায্য করে। এই ধরনের উপন্যাসে একজন ঔপন্যাসিক ঘটনার মধ্যে সামনেও চলে যেতে পারেন, পেছনেও নিয়ে যেতে পারেন। ইসমায়িল রিড-এর *ফ্লাইট টু কানাডা*-এ আব্রাহাম লিংকন টেলিফোন ব্যবহার করেছেন। এই কৌশলটি প্রায়ই সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সময়ের ভাঙন এবং আগে-পিছে যাওয়ার কৌশল সিনেমায় আরো বেশি ব্যবহৃত হয়। (মামুন অর রশীদ, *উত্তর-আধুনিকতা*, সংবেদ, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৯২)

হিস্টোরিগ্রাফিক মেটাফিকশনে কখনো ব্যক্তি (যেমন: গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের *দি জেনারেল ইন হিজ ল্যাবরিন্থ*—যা মূলত সিমন বলিভারকে নিয়ে রচিত, কখনোওবা ঘটনা (যেমন : রাবিহ আলামেদ্দিনের *কুলাইডস : দ্যা আর্ট অব ওয়ার* উপন্যাসে লেবাননের সিভিল ওয়ারের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে রচিত) ঔপন্যাসিকের হাতে ভিন্নভাবে তথা নতুনভাবে উপস্থাপিত হয়। ইতিহাসের সঙ্গে ঔপন্যাসিকের পর্যবেক্ষণ, জীবনদর্শন, কল্পনা ও গল্প-পরিবেশন-কৌশল এমনভাবে এ-জাতীয় উপন্যাসে মিশে যায় কখনো কখনো ইতিহাস এর প্রভাবে বিভ্রমাত্মকও হয়ে ওঠে, কখনো তা হয়ে ওঠে নিখুঁত, আবার কখনো ইতিহাসের অধিক প্রভাবশালী।

৬ শহীদুল জহির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

৭ শহীদুল জহির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

৮ শহীদুল জহির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

৯ শহীদুল জহির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

১০ মোহাম্মদ আবদুর রশীদ, [সম্পাদিত], *শহীদুল জহির সমগ্র*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৯৪২-৯৪৩

১১ শহীদুল জহির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

১২ শহীদুল জহির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩-৬৪

১৩ উত্তর-আধুনিক সাহিত্য ও সাহিত্য-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বহুব্যবহৃত ও গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিভাষা ইন্টারটেক্সচুয়ালিটি বা আন্তর্বয়ন। বাংলা ভাষায় উত্তর-আধুনিকবাদ বিষয়ক একজন গ্রন্থপ্রণেতার এই পরিভাষা-সংক্রান্ত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়—

টেক্স্টের ভেতরকার আন্তঃসম্পর্কের পরিস্থিতিকে ইন্টারটেক্সচ্যুালিটি বলা হয়। প্রত্যেক লেখকই অন্য অন্য লেখক বা লেখকের টেক্স্ট দ্বারা প্রভাবিত, এবং প্রত্যেক টেক্স্টই বিভিন্ন টেক্স্টের দিকে উন্মুক্ত। টেক্স্টের ভেতর বিচিত্র উল্লেখ থাকে এবং থাকা স্বাভাবিক; সেই উল্লেখ সর্বদা সুস্পষ্ট নয়, কখনো কখনো সংগোপন ও আচ্ছাদিত; লেখকেরা বিভিন্নভাবে অতিক্রান্ত বয়ানের প্রতিধ্বনি করেন—চেতন কিংবা অচেতনভাবে। পাঠকের কর্তব্য হলো : এই 'আন্তঃপাঠকেন্দ্রিক' সম্পর্কের (ইন্টারটেক্সচ্যুয়াল রিলেশনশিপ) আবিষ্কার ও বিবেচনা। উত্তর-আবয়বিক সমালোচকেরা এমনও বলেছেন যে, আন্তর্বয়ানের সূত্র ছাড়া টেকস্টের অর্থোপলব্ধি ও ব্যাখ্যা অসাধ্য। কেউ কেউ সাহিত্যকাজের সঙ্গে অপরাপর ডিসকোর্সের সম্পর্ককেও 'ইন্টারটেক্সচ্যুয়ালিটি' বলেন : যেমন যোশেফ কনরাডের 'হার্ট অফ ডার্কনেস' উপন্যাসের সঙ্গে সমকালীন ডিসকোর্সের সম্পর্ক। এডওয়ার্ড সাইদ এই ইন্টারটেক্সচ্যুয়াল পদ্ধতিতে কনরাডের উপন্যাস পাঠ করেছেন। (সালাহউদ্দীন আইয়ুব, *সংস্কৃতির জিজ্ঞাসা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৪৪)

১৪ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, *উপন্যাস সমগ্র*, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৫, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬, পৃ. ৭১

১৫ শহীদুল জহির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩-৫৪

১৬ প্যারাডাইম শিফট (Paradigm shift) উত্তর-আধুনিক বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে উদ্ভূত পরিভাষা হলেও তা সমাজ-রাষ্ট্র-আর্থ-রাজনীতি-শিল্প সাহিত্য তথা মানব জীবনানুষঙ্গের সব ক্ষেত্রের বড় ধরনের রূপান্তর বোঝাতে এখন ব্যবহৃত হয়। Thomas Kuhn তাঁর *The Structure of Scientific Revolutions* (1962) গ্রন্থে Paradigm shift সংক্রান্ত ধারণা প্রকাশ করেন।

A Paradigm shift is a fundamental change in the basic concepts and experimental practices of a scientific discipline...Even though Kuhn restricted the use of the term to the natural sciences, the concept of a paradigm shift has also been used in numerous non-scientific contexts to describe a profound change in a fundamental model or events, (Wikipedia)

১৭ চঞ্চল আশরাফ, উপন্যাস-পাঠ : *সে রাতে পূর্ণিমা ছিল*, অনিকেত শামীম (সম্পাদিত), *লোক*, ২০০৮, পৃ. ২১

১৮ শহীদুল জহির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

১৯ লিন্ডা হাচিয়েনের মতে, উত্তর-আধুনিক আখ্যান মূলত আইরনিতে ভরা বাক্যের সমাবেশ। এই আইরনিতে থাকবে ব্ল্যাক হিউমার (black humar), কিংবা ক্রীড়া (playfulness), যা দেরিদার ক্রীড়াময়তার চিন্তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ এবং রোলাঁ বার্থের দ্য প্লেজার অব দি টেক্সট থেকে উৎসাহ পাওয়া। এই ধরনের ক্রীড়া ও ব্ল্যাক হিউমারের প্রাধান্য রয়েছে জন বার্থ, জোসেফ হিলার, উইলিয়াম গেডিডস, কুর্ট ভনেগাট প্রমুখের উপন্যাসে। (মামুন অর রশীদ, *উত্তর-আধুনিকতা*, সংবেদ, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৮৭)

২০ শহীদুল জহির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

২১ শহীদুল জহির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫

২২ শহীদুল জহির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭

২৩ বর্তমান টেক্সটকে উপলক্ষ্য করে অতীত টেক্সটের প্রসঙ্গ অবতারণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয় বাখতিনের উপন্যাস-চিন্তা। উত্তর-আধুনিক উপন্যাস বিশ্লেষণে বাখতিন প্রাসঙ্গিক এই জন্য যে আখ্যানতত্ত্ব বিশ্লেষণে আলোচকরা তাঁকেই অনুসরণ করতেন তাঁর অগ্রগামী চিন্তার জন্য। প্রসঙ্গত উদ্ধৃত হতে পারেন দেবেশ রায়– মিখাইল বাখতিন, দস্তয়েভস্কির উপন্যাসের পাঠোদ্ধারের প্রয়োজনে ইয়োরোপের প্রাচীন কার্নিভাল সাহিত্যের কাছে, গ্রিক কমেডির কাছে, মিনপ্লিয়ান নাটকের কাছে ও খ্রিষ্টীয় ইউরোপের স্বীকারোক্তির সাহিত্যের কাছে, (দেবেশ রায়, *উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৩২) গিয়েছিলেন।

২৪ উপন্যাসের ভাষা কীভাবে কাজ করে, এ প্রসঙ্গে বাখতিন এই শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেন।

২৫ মোহাম্মদ আজম, *মিখাইল বাখতিন : যাপিত জীবন, ভাষা ও উপন্যাস*, প্রকৃতি ঢাকা, ২০২০, পৃ. ৬৪

২৬ শহীদুল জহির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩-৫৪